Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আধুনিক বিশ্বে কুরআনের বাস্তব নিদর্শন প্রকাশ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রুমি আক্তার

রোলঃ ২৩১০০১২০৪২০

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আধুনিক বিশ্বে কুরআনের বাস্তব নিদর্শন প্রকাশ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রুমি আক্তার

রোলঃ ২৩১০০১২০৪২০

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " আধুনিক বিশ্বে কুরআনের বাস্তব নিদর্শন প্রকাশ " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে রুমি আক্তার, আইডিঃ ২৩১০০১২০৪২০ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " আধুনিক বিশ্বে কুরআনের বাস্তব নিদর্শন প্রকাশ " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

রুমি

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

রুমি আক্তার

আইডিঃ ২৩১০০১২০৪২০

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 6

আল কুরআন কি আল্লাহর বাণী 8

বিজ্ঞান নিয়ে কুরআন কি বলে 10

আল কুরআনে বিশ্বসৃষ্টি তত্ত্ব(Cosmology) 10

মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব (Big Bang Theory) 12

মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ (The expanding universe) 13

মহাবিশ্বের সংকোচন (The Closed Big Bang Theory) 14

সপ্ত স্তরে বিন্যস্ত আসমান 15

সূর্য ঘুরে নাকি পৃথিবী ঘুরে? 16

চাঁদের নিজস্ব কোন আলো নেই 17

জ্যামিতিক রাশিচক্র(Zodiacal Belt) 19

পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষায় চমৎকার ব্যবস্থাপনা:পানিচক্র (Water Cycle) 20

পরিমিত বৃষ্টিপাত 23

আকাশ কি সত্যিই নীল! 24

পর্বত পেরেকসদৃশ 25

মানবজীবনের ক্রমবিকাশ:মানবভ্রূণ 26

অন্ধকার তিনটি পর্দা 29

যাওজাইনিজ জাকারা ওয়াল উনছা 30

আধুনিক প্রযুক্তি :ফিঙ্গারপ্রিন্ট 31

পেইন রিসেপ্টর (Pain Receptor) 32

প্রতিটি জীব পানি হতে সৃষ্ট 33

সবকিছুই জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করা হয়েছে 34

মৌমাছির কর্মবন্টন ও সরলপথ 35

পিপীলিকার জীবনপদ্ধতি 36
চিকিৎসাশাস্ত্রে মধু 38
Hurt and Pollution 39
শূকরের মাংস খাওয়া কেন হারাম? 40
সালাতের উপকারিতা:বৈজ্ঞানিক রহস্য 42
আল কুরআন তিলাওয়াতের বৈজ্ঞানিক উপকারিতা 44
উপসংহার 46
রেফারেন্সসমূহ: 47

بِسۡمِ اللهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ
দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

ভূমিকা

:পৃথিবীর বুকে মহান আল্লাহ তা'য়ালার দেওয়া অগণিত নেয়ামতের অন্যতম একটি নেয়ামত হলো পবিত্র আল কুরআন। মানবজাতির মুক্তির দিশা,হেদায়েতের আলো হিসেবে আল্লাহ তা'য়ালা তার প্রিয় নবি মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর কুরআন নাযিল করেছেন।কুরআন মুমিনদের জন্য অন্তরের শেফা, এতে রয়েছে বহু নিদর্শন।প্রায় দেড় হাজার বছর আগে মরুর বুকে ঘটেছিল এর আগমন। সেই সময় থেকে অদ্যাবধি যার প্রতিটি অক্ষর জিইয়ে আছে, কোন রদবদল হয়নি এবং ভবিষ্যতেও হবেনা কারণ স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন তিনি নিজেই এর হেফাজতকারী।কাজেই যিনি স্বয়ং মালিক এর হেফাজতকারী, কে এমন আছে যে এর বিকৃতি ঘটানোর ক্ষমতা রাখে?

وَتَمَّتۡ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدۡقًا وَّعَدۡلاً ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ۚ وَهُوَ السَّمِيۡعُ الۡعَلِيۡمُ

“সত্য ও ন্যায়ের দিক দিয়া তোমার প্রতিপালকের বাণী পরিপূর্ণ। তাঁহার বাক্য পরিবর্তন করিবার কেহ নাই। আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।”

(সূরা আল আনআম,আয়াত : ১১৫)

যারা কুরআনকে অস্বীকার করে তাদেরকে পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তা'য়ালা সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন।যদি সত্যিই এটি মানবরচিত কোন কিতাব হয়ে থাকে তাহলে তারাও যেন অনুরূপ কোন সূরা রচনা করে নিয়ে আসে। কিন্তু আজ অবধি গোটা বিশ্বের কেউ এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণের সাহস পায়নি।এটাই পবিত্র আল কুরআনের অলৌকিকতার বড় একটি প্রমাণ।

শুধু তাই নয়।প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে নাযিল হওয়া কুরআনে যা বলা আছে সেগুলো বিজ্ঞানীরা এ সময়ে এসে আবিষ্কার করছে।কুরআনের সাহায্যে বিভিন্ন সমস্যার

সমাধানও খুঁজছে।পবিত্র আল কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন এতে জ্ঞানীদের জন্য রয়েছে নিদর্শন।

তবুও অনেক নাস্তিক সময়ের আবহে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করে কুরআনকে ভুল প্রমাণ করতে চায় অথচ কুরআন এ যুগে তৈরি হওয়া হাজার হাজার থিওরির উত্তর অনেক আগেই দিয়েছে।ফলে কুরআন ও বিজ্ঞান সাংঘর্ষিক নয় বরং বিজ্ঞানের সম্ভাবনা যেখানে শূন্য সেখান থেকেই কুরআনের শুরু।কুরআন এজন্যই বিজ্ঞানময়।এই লেখনীতে মূলত আধুনিক বিশ্বে কিভাবে কুরআনের বাস্তব নিদর্শনসমূহের প্রকাশ ঘটছে সেই বিষয়গুলোই বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

আল কুরআন কি আল্লাহর বাণী

বিভিন্ন সময়ে নানান সংশয়বাদীরা কুরআন নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করেছে তার মধ্যে বহুল আলোচিত একটি প্রশ্ন হল আল কুরআন কি আল্লাহর বাণী?পবিত্র আল কুরআনে স্বয়ং আল্লাহ নিজেই এর উত্তর দিয়েছেন।সূরা আশ শু-আরার ১৯২ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে-

وَاِنَّهٗ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

"নিশ্চয়ই আল - কুরআন জগতসমূহের প্রতিপালক হইতে অবতীর্ণ।" [সূরা আশ শো'আরা,আয়াত:১৯২)

যেহেতু বর্তমান আধুনিক যুগে বিজ্ঞান অনেক এগিয়ে গিয়েছে ফলে মানুষও অনেক বেশি যুক্তিবাদী হয়ে উঠেছে।তারা স্বাধীনচেতায় যেমন বিশ্বাসী তেমনি কোন কিছুর কারণ ও যুক্তি ছাড়া তা মেনে নেওয়া তাদের কাছে অসম্ভব বিষয়। ফলে কুরআন যে ঐশীবাণী, মানুষের তৈরি কোন কিতাব নয় এটা মেনে নেওয়ার জন্যও তাদেরকে এর যথাযথ কারণ ও যুক্তি দেখাতে হবে।এক্ষেত্রে স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালাই গোটা মানবজাতিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন।আল্লাহ বলেছেন যদি কুরআন মানুষের রচিত কোন কিতাব হয়েই থাকে তাহলে অনুরূপ কোন সূরা বা অন্তত আয়াত রচনা করে দেখাতে।আশ্চর্যের বিষয় হলো কুরআন নাযিলের পর থেকে আজ অবধি গোটা বিশ্বের কেউই এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়নি।

পবিত্র আল কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰٓى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا

“বল, ‘যদি কুরআনের অনুরূপ কুরআন আনয়নের জন্য মানুষ ও জিন সমবেত হয় এবং যদিও তাহারা পরস্পরকে সাহায্য করে তবুও তাহারা ইহার অনুরূপ আনয়ন করিতে পারিবে না।”[সূরা বানী ইসরায়েল ;৮৮]

وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ
فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوْا النَّارَ الَّتِىْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ

"আমি আমার বান্দার প্রতি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছি তাহাতে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকিলে তোমরা ইহার অনুরূপ কোন সূরা আনয়ন কর এবং তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে আহ্বান কর।যদি তোমরা আনয়ন না কর এবং কখনই করিতে পারিবে না, তবে সেই আগুনকে ভয় কর, মানুষ ও পাথর হইবে যাহার ইন্ধন, কাফিরদের জন্য যাহা প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছে।"
[সূরা বাক্বারাহ;২৩-২৪]

মানুষ মাত্রই ভুল।ফলে মানুষের তৈরি কিতাবে বার বার সংস্করণ প্রয়োজন হয়।কিন্তু পবিত্র আল কুরআন নাযিলের পর থেকে এখন পর্যন্ত এতে কোন ধরনের অসংগতি পরিলক্ষিত হয়নি।বিজ্ঞানের কিছু খোড়া যুক্তি দিয়ে কুরআনকে অনেকে অনেকবার ভুল প্রমাণ করতে চেয়েছে কিন্তু পারেনি বরং হিতে বিপরীত হয়ে তাদের তথাকথিত যুক্তি,তত্ত্বই ব্যর্থ হয়েছে।সংশয়বাদীদের জন্য এটি অনেক বড় একটি নিদর্শন। কেননা যদি কুরআন আল্লাহর বাণীই না হতো তাহলে এতে অসংখ্য ভুলভ্রান্তি থাকতো।

পবিত্র কুরআনে স্বয়ং আল্লাহ নিজেই মানবজাতির জন্য কুরআনের অলৌকিকতার প্রমাণ পেশ করেছেন--

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ ۭ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا

"তবে কি তাহারা কুরআন সম্বন্ধে অনুধাবন করে না? ইহা যদি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট হইতে আসিত তবে তাহারা উহাতে অনেক অসংগতি পাইত।"(সূরা আন নিসা,আয়াত:৮২)

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۙ

"ইহা সেই কিতাব; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, মুত্তাকীদের জন্য ইহা পথ - নির্দেশ,"
(সূরা বাক্বারাহ,আয়াত:০২)

বিজ্ঞান নিয়ে কুরআন কি বলে

পবিত্র আল কুরআন নির্দিষ্ট করে বিজ্ঞানের কোন গ্রন্থ নয় তবে বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ব-কথন এতে রয়েছে যা আদৌ মানুষের কল্পনাতেও ছিলনা।এতে বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট প্রায় ১ হাজারেরও অধিক আয়াত রয়েছে।

বিজ্ঞানের তত্ত্ব পরিবর্তনশীল।কিন্তু কুরআনের বাণী শ্বাশত ও চিরন্তন।ফলে কুরআন বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট যেই তথ্য উপস্থাপন করেছে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এগুলো বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব, পরিবর্তনশীল কোন তত্ত্ব নয়।যেমন-মহাবিশ্ব সৃষ্টি সংক্রান্ত বিগব্যাং তত্ত্ব, গ্রহ নক্ষত্রের নিজ নিজ কক্ষপথে প্রদক্ষিণ,পানিচক্র,মানব-ভ্রূণ তত্ত্ব, উদ্ভিদজগত - প্রাণীজগতের প্রজনন,সমুদ্রবিজ্ঞান,সামাজিক বিজ্ঞান,ফ্রিঙ্গারপ্রিন্ট প্রযুক্তি,আধুনিক প্রযুক্তির আরও নানান দিক সহ অনেক কিছুই কুরআন প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছে।মানুষ মাত্র কয়েক শতাব্দী পূর্ব থেকে বিজ্ঞান চর্চা শুরু করেছে।কাজেই বিশ্বজগতের মহামহিম সৃষ্টিকর্তার জ্ঞানের কাছে মানুষের জ্ঞান যে নিতান্তই তুচ্ছ এটা তারই প্রমাণ বহন করে।

সূরা কাহফে ১০৯ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে-

قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّیْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّیْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا

“বল, ‘আমার প্রতিপালকের কথা লিপিবদ্ধ করিবার জন্য সমুদ্র যদি কালি হয়, তবে আমার প্রতিপালকের কথা শেষ হইবার পূর্বেই সমুদ্র নিঃশেষ হইয়া যাইবে - আমরা ইহার সাহায্যার্থে ইহার অনুরূপ আরও সমুদ্র আনিলেও।”

আল কুরআনে বিশ্বসৃষ্টি তত্ত্ব(Cosmology)

অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্ব বা Cosmology-এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে-" scientific study of the universe and its origin and development" অর্থাৎ মহাবিশ্বের উৎপত্তি,এর বিকাশ এবং এর গঠন নিয়ে বৈজ্ঞানিক যে আলাপ আলোচনা ও অধ্যয়ন,একে বলা হয় মহাজাগতিকবিদ্যা বা বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্ব (Cosmology)।প্রাচীনকাল থেকেই মহাবিশ্ব কি, কেন তৈরি হয়েছে,কিভাবে তৈরি হয়েছে এ নিয়ে কৌতূহলী ও অনুসন্ধিৎসু মানুষের মনে নানান প্রশ্ন তৈরি হয়েছে।কালক্রমে বিভিন্ন তত্ত্বও আবিষ্কৃত হয়েছে।তন্মধ্যে বিজ্ঞান মহলে সবচেয়ে স্বীকৃত তত্ত্ব হল মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব বা Big Bang Theory।

বিজ্ঞানীরা কেবল এই তত্ত্বেই থেমে থাকেননি।বিংশ শতাব্দীতে আরেকটি যুগান্তকারী তত্ত্ব আবিষ্কার করে মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ তত্ত্ব (The expanding universe)।বর্তমান সময়ে এসে আরেকটি গ্রহণযোগ্য তত্ত্ব আবিষ্কার করা হয়েছে যা মহাবিশ্বের সংকোচন সংক্রান্ত তত্ত্ব (Closed Big Bang)।

এই ৩ টি তত্ত্বের সমন্বয় করলে বলা যায় যে,বিজ্ঞানীদের মতে মহাবিশ্বের সৃষ্টি ঘটেছে এক মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে, এরপর এর সম্প্রসারণ ঘটেছে এবং একসময় এর সংকোচন ঘটবে।অতঃপর এর মধ্যদিয়েই সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে।আশ্চর্যের বিষয় হলো প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বেই পবিত্র আল কুরআন বিশ্বজগৎ সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে এই জ্ঞানগর্ভ তথ্যগুলো উপস্থাপন করেছে।পরবর্তী আলোচনাতে কুরআনের আয়াতসহ এই তত্ত্বসমুহ তুলে ধরা হয়েছে।

মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব (Big Bang Theory)

আধুনিক বিজ্ঞানীরা বিশ্বজগৎ সৃষ্টির যে মৌলিক তত্ত্ব আবিষ্কার করেছে এটি বিজ্ঞান মহলে মহাবিস্ফোরণ বা Big Bang Theory নামে পরিচিত।লেখক মুহাম্মদ আবু তালেব তার "বিজ্ঞানময় কুরআন" বইয়ে উল্লেখ করেছেন-১৯২৭ সনে বেলজিয়াম জোতির্বিজ্ঞানী G.Lamaitre এই তত্ত্বটি প্রস্তাব করেন।Big Bang হলো এমন একটি ঘটনা যার আগে গ্রহ,নক্ষত্র, পালসার,ছায়াপথ কোনকিছুই ছিল না।সবকিছুই পুঞ্জিভূত অবস্থায় ছিল।

মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব মতে, সমগ্র বিশ্বজগত প্রাথমিক অবস্থায় বিশাল একটি পিন্ড আকারে বিদ্যমান ছিল।এরপর সেখানে ঘটে এক মহাবিস্ফোরণ (মাধ্যমিক পৃথকীকরণ)।এরই ফলে তৈরি হয় অসংখ্য ছায়াপথ।সেগুলো বিভক্ত হয়ে তৈরি হয় গ্রহ,নক্ষত্রপুঞ্জ,সূর্য, চন্দ্র ইত্যাদি। এই মহাবিস্ফোরণের ঘটনা হঠাৎ করে বা 'দৈবক্রমে 'ঘটবার সম্ভাবনা শূন্য পর্যায়ে।বরং যিনি সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা তিনিই বিশ্বজগত তৈরি করেছেন।Big Bang যেখানে এতদিন পর এসে এই থিওরি দাঁড় করাচ্ছে সেখানে মহান আল্লাহ অনেক আগেই তার প্রিয় নবি ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর পবিত্র আল কুরআন নাযিল করে তা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন।সূরা আম্বিয়ার ৩০ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে-

اَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا ؕ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَىْءٍ حَيٍّ ؕ اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ

"যাহারা কুফরী করে তাহারা কি ভাবিয়া দেখে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী মিশিয়া ছিল ওতপ্রোতভাবে, অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক করিয়া দিলাম ; এবং প্রাণবান সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিলাম পানি হইতে; তবু কি উহারা ঈমান আনিবে না?"

অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবী একত্রে মিশে ছিল।বিস্ফোরণের মাধ্যমে তা আলাদা হয়ে গিয়েছে।সুতরাং যারা কুরআন নিয়ে সংশয় প্রকাশ করে তারা কি ভেবে দেখে না যে,প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে মরুময় বুকে নাযিল হওয়া কিতাব যদি সত্যিই আল্লাহর বাণী না হয় তাহলে কিভাবে এত দ্ব্যর্থহীনভাবে বিশ্বজগৎ সৃষ্টি ও উৎপত্তির রহস্য উপস্থাপন করে?

মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ (The expanding universe)

Big Bang তত্ত্বানুসারে আমরা জানতে পেরেছি যে,এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে এক মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে।এই একই ঘটনা বহু পূর্বেই কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে।বিজ্ঞানীরা এই বিগব্যাং তত্ত্ব আবিষ্কার করার পরপরই আরেকটি বিষয় সামনে নিয়ে আসে।

১৯২৯ সনে বিজ্ঞানী হাবল প্রকাশ করেন যে,গ্যাল্যাক্সি তথা ছায়াপথগুলো আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।বিজ্ঞানের সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী ২০০০ সালে বলা হয়,আমাদের মহাবিশ্ব জুড়ে ৫০,০০০ হাজার কোটি গ্যালাক্সি রয়েছে।প্রতিনিয়ত নতুন গ্যালাক্সির জন্ম হচ্ছে এবং এর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।প্রতিনিয়ত এই গ্যালাক্সিগুলোর মধ্যে দূরত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর মূল কারণ ও বিজ্ঞানীরা অনুসন্ধান করে বের করেছেন।এর মূল কারণ হল force of expansion অর্থাৎ মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ গতি।ফলে নি:সন্দেহে বলা যায় মহাবিশ্ব সুষমহারে দিনকে দিন বৃদ্ধি পেয়েই যাচ্ছে,এর সম্প্রসারণ ঘটছে।

শুধু বিজ্ঞানীরা এই আশ্চর্যজনক তথ্য দিয়েছে তাই নয় বরং এর চেয়েও অনেক আগে স্বয়ং আল্লাহ তার পবিত্র আল কুরআনে মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ সম্পর্কে বিবৃতি উপস্থাপন করেছেন।সুরা যারিয়াতের ৪৭ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে-

وَ السَّمَآءَ بَنَيْنٰهَا بِاَيْىدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ

"আমি আকাশ নির্মাণ করিয়াছি আমার ক্ষমতাবলে এবং আমি অবশ্যই মহা - সম্প্রসারণকারী।"

সূরা তাকভিরের ১৫,১৬ নং আয়াতেও আল্লাহ তা'য়ালা সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন,নক্ষত্র সমূহ চারিদিকে কিভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে।যা মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ এর একটি দিক।

فَلَآ اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ۙ
الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ۙ

"যাহা প্রত্যাগমন করে ও অদৃশ্য হয়,
আমি শপথ করি পশ্চাদপসরণকারী নক্ষত্রের,"

মহাবিশ্বের সংকোচন (The Closed Big Bang Theory)

বিজ্ঞানী Freeman একটি নকশা প্রণয়ন করেন।তার মতে,মহাবিশ্ব সংকুচিত হয়ে একটি বিন্দুতে চলে আসবে এবং একটা Big Crunch ঘটবে।এর প্রায় ১বিলিয়ন বছর পূর্বেই গ্যালাক্সিসমূহের মধ্যকার ফাঁকা স্থান (space) গুলো গুটিয়ে আসবে এবং প্রায় ১০০ মিলিয়ন বছর পূর্ব থেকে প্রত্যেকটি গ্যালাক্সির নিজ নিজ দূরত্বও সংকুচিত হয়ে আসবে।মহাবিশ্বে তখন তারকারাজিতে পূর্ণ হয়ে যাবে।একসময় এই তারকাসমূহ এক সঙ্গে সূর্যের মতো কিরণ বিচ্ছুরণ করবে এবং তারকাগুলোর মধ্যে সংঘর্ষ তৈরি হবে। এর ফলে তৈরি হবে অসংখ্য কৃষ্ণবিবর বা ব্ল্যাকহোল।এই ব্ল্যাকহোল একসময় পরস্পর আকৃষ্ট হয়ে একাকার হয়ে বস্তুপিন্ডে পরিণত হবে।এটাই হলো Big Crunch বা The closed Big Bang।

মহাবিশ্বের সংকোচন সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের সূরা আম্বিয়ার ১০৪ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে-

يَوْمَ نَطْوِىْ السَّمَآءَ كَطَىِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ؕ كَمَا بَدَاْنَآ اَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيْدُهٗ ؕ وَعْدًا عَلَيْنَا ؕ اِنَّا كُنَّا فٰعِلِيْنَ ۚ

“সেই দিন আকাশমণ্ডলীকে গুটাইয়া ফেলিব, যেভাবে গুটান হয় লিখিত দফতর; যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করিয়াছিলাম সেইভাবে পুনরায় সৃষ্টি করিব; প্রতিশ্রুতি পালন আমার কর্তব্য, আমি ইহা পালন করিবই।”

সপ্ত স্তরে বিন্যস্ত আসমান

মানুষের অজানাকে জানার অদম্য আগ্রহ সৃষ্টির শুরু থেকেই বিদ্যমান ছিল।সুপ্রাচীনকাল থেকেই মহাকাশ নিয়ে মানুষের আগ্রহী ও ভাবনা উদ্দিপক মনে বিভিন্ন প্রশ্ন এসে জড়ো হতো।এ নিয়ে বিভিন্ন কাল্পনিক গল্পও তারা তৈরি করে ফেলেছিল।তবে বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার ফলে মানুষ এখন আর কাল্পনিক ঘটনায় নয় বরং স্বচক্ষে মহাকাশ পর্যবেক্ষণ করছে।কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন করে মহাকাশ নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছে,বিভিন্ন রোবটযান পাঠাচ্ছে।এমনকি মানুষ যে একসময় মহাকাশ জয় করবে কুরআন সেটা প্রায় দেড় হাজার বছর আগেই ভবিষ্যতবাণী করেছে।

মহাকর্ষ বলের প্রভাবে মহাকাশ মোট ৭ টি স্তরে বিভক্ত হয়েছে যেগুলোকে আমরা বলি সপ্ত আকাশ।নবম শতাব্দীর মুসলিম বিজ্ঞানী আল কারেজমি সর্বপ্রথম এই সপ্ত বা সাত স্তরের ধারণা প্রদান করেন।

পবিত্র আল কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা এ বিষয়ে উল্লেখ করেছেন -

هُوَ الَّذِیْ خَلَقَ لَـكُمْ مَّا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا ثُمَّ اسْتَوٰۤی اِلَی السَّمَآءِ فَسَوّٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ ؕ وَهُوَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ ۝

"*তিনি পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, তৎপর তিনি আকাশের দিকে মনোসংযোগ করেন এবং উহাকে সপ্তাকাশে বিন্যস্ত করেন; তিনি সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত।*"
(সূরা বাকারাহ, আয়াত:২৯)

اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا
'তোমরা কি লক্ষ্য কর নাই, আল্লাহ্ কিভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন সপ্তস্তরে বিন্যস্ত আকাশমন্ডলী ?

(সূরা নূহ,আয়াত:১৫)

সূর্য ঘুরে নাকি পৃথিবী ঘুরে?

বিজ্ঞান মহলে একটি বিতর্কিত ধারণা অনেক দিন থেকেই প্রচলিত ছিল।সুপ্রাচীনকাল থেকে বিশ্বাস করা হতো পৃথিবী নামক গ্রহটি স্থির এবং সূর্যসহ সবকিছুই একে কেন্দ্র করে ঘূর্ণায়মান রয়েছে।এই মতবাদের প্রবক্তা হলো বিজ্ঞানী টলেমি।পরবর্তীতে ১৫১২ খ্রিষ্টাব্দে আরেক বিজ্ঞানী নিকোলাস কোপারনিকাস ঠিক এর উলটো তত্ত্ব দাড় করান।তার মতে,পৃথিবীকে কেন্দ্র করে নয় বরং সূর্যকে কেন্দ্র করে সমস্ত কিছুই ঘুরছে,প্রদক্ষিণ করছে।

মজার ব্যাপার হলো এই তত্ত্ব আবিষ্কারের পূর্বে যে মতবাদ প্রচলিত ছিল মানুষজন সেটাকে চিরন্তন সত্য হিসেবে অন্ধের মতো বিশ্বাস ও করে গেছে।আবার যখন নতুন মতবাদ আসলো এটার ক্ষেত্রেই ঠিক তাই ই হলো।বিজ্ঞানমনস্ক বলে দাবি করা মানুষগুলো এভাবেই সময়ে সময়ে পাল্টাতে থাকা তত্ত্বগুলোকে বেশ কদর করতো।কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো এই দুই মতবাদের কোনটাই প্রতিষ্ঠিত কোন সত্য তথ্য ছিল না, তবুও ইতিহাসের পাতায় দাপড়ে বেরিয়েছে কয়েক শতাব্দী, ভাবা যায়!
পবিত্র আল কুরআন এই বিষয় এর সমাধান অনেক আগেই দিয়ে রেখেছে। ইরশাদ হচ্ছে-

لَا الشَّمْسُ يَنْۢبَغِيْ لَهَآ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ؕ وَكُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ

“সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চন্দ্রের নাগাল পাওয়া এবং রজনীর পক্ষে সম্ভব নয় দিবসকে অতিক্রম করা; এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করে।”

(সূরা ইয়াসীন,আয়াত:৪০)
অর্থাৎ পৃথিবী ও সূর্য উভয়ই ঘোরে। শুধু তা-ই নয়, আসমানে যত গ্রহ-উপগ্রহ ও নক্ষত্ররাজি আছে সবই নিজ নিজ কক্ষ পথে পরিভ্রমণ করে চলছে আপন গতিতে।

শায়খ আলবানী উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আয়াতে পরপর তিনটি শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন যমীন, সূর্য ও চন্দ্র। অতঃপর বলা হয়েছে ‘প্রত্যেকটিই স্ব স্ব নিরক্ষবৃত্তে সাঁতার কাটছে’। যা প্রমাণ করে যে, পৃথিবীও সন্তরণ করছে *(সিলসিলাতুল*

হুদা ওয়ান নূর ৪৯৭/১০)। ড. ওয়াহবাতুয যুহায়লী বলেন, সূর্য, চন্দ্র, যমীন প্রত্যেকে আকাশের নিজ কক্ষ পথে সন্তরণ করছে যেমন মাছ পানিতে সাতার কাটে *(আত-তাফসীরুল মুনীর ২৩/১৭)*।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা এই আয়াতে যে বিশদ বিবরণ উপস্থাপন করেছেন তা মাত্র সম্প্রতি আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানী প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে।তাহলে কি মনে প্রশ্ন তৈরি হয় না,এই জ্ঞানগর্ভ জ্ঞানের উৎস মহান আল্লাহ তা'য়ালা ছাড়া আর কে হতে পারে!

চাঁদের নিজস্ব কোন আলো নেই

কবি সাহিত্যিক কিংবা দার্শনিক সকলের কাছেই প্রকৃতির অপূর্ব এক সৌন্দর্যের নাম হলো চাঁদ।আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা তার সৃষ্টিকে করেছেন বিস্ময়কর।প্রতিটি সৃষ্টির মাঝেই রয়েছে তার সূক্ষ্ম নৈপুণ্যতা।সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী সৌরজগতে সবমিলিয়ে ৪৮ টি উপগ্রহ রয়েছে।এর মধ্যে চাঁদ হলো পৃথিবী নামক গ্রহের একমাত্র উপগ্রহ।

উপগ্রহ গ্রহের মতো কঠিন পদার্থ দ্বারা গঠিত হলেও এদের নিজস্ব কোন আলো নেই।তবে নিজস্ব কক্ষপথ রয়েছে।চাঁদের ক্ষেত্রেও তাই।রাতের আকাশে উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হয়ে জ্যোৎস্না ছড়ানো চাঁদের নিজস্ব কোন আলো নেই। বরং সূর্য থেকে প্রতিফলিত আলো পেয়ে চাঁদ নিজে আলোকিত হয়, নচেৎ চাঁদ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়েই থাকতো।

প্রতিফলিত হওয়ার বিষয়টা আরেকটু বিশদ ভাবে জানা যাক।এতে পুরো প্রক্রিয়াটাই আয়ত্ত করা সহজ হবে।প্রথমেই সূর্য থেকে চাঁদ বা চন্দ্রের পৃষ্ঠে আলো পতিত হয়।সেই আলোতে থাকে সাতটি রঙ।এর মধ্যে হলুদ,কমলা ও লাল এই ৩ টি রঙ চাঁদের মাটিতে শোষিত হয়।সেখান থেকে আলো প্রতিফলিত (reflection) হয়ে এসে ভূ-পৃষ্ঠে এসে পড়ে।আর আমরা পৃথিবীবাসীগণ চাঁদের সেই আলোকিত ভূ-ভাগ দেখে জ্যোৎস্না বিলাস করি, আনন্দ উপভোগ করি।

আশ্চর্যের বিষয় হলো চাঁদের যে নিজস্ব কোন আলো নেই এবং সূর্য থেকে প্রাপ্ত আলোতে আলোকিত হয় এই ঘটনাটিও পবিত্র আল কুরআনে উল্লেখ রয়েছে।কাজেই সত্যিই যদি মহাশক্তিধর কোন স্বত্তা না থাকতো কিভাবে এতকিছু পরিচালিত হতো এত নিখুঁত ও সূক্ষ্মপ্রণালিতে এটা কি ভাবনার খোরাক জোগায় না?

পবিত্র কুরআনের সূরা ইউনুসের ৫নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে-

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَآءً وَّالْقَمَرَ **نُوْرًا** وَّقَدَّرَهٗ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ ؕ مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلَّا بِالْحَـقِّ ۚ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ

“তিনিই সূর্যকে তেজস্কর ও চন্দ্রকে জ্যোতির্ময় করিয়াছেন এবং উহার মন্যিল নির্দিষ্ট করিয়াছেন যাহাতে তোমরা বৎসর গণনা ও সময়ের হিসাব জানিতে পার। আল্লাহ্ ইহা নিরর্থক সৃষ্টি করেন নাই। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি এই সমস্ত নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করেন।”

এখানে চাঁদের আলো বুঝাতে “নুরাও” শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।এর অর্থ হলো কোন আলোর উৎস হতে আলো প্রাপ্ত হয়ে আলোকিত হওয়া।ফলে এটাই প্রমাণিত হয় যে,চাঁদ সূর্য থেকে প্রাপ্ত আলোতে আলোকিত হয় এর নিজস্ব কোন আলো নেই।

জ্যামিতিক রাশিচক্র(Zodiacal Belt)

রাতের আকাশে অসংখ্য তারা জ্বল জ্বল করতে থাকে।জ্যোতির্বজ্ঞানীরা আকাশের পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব দিক অবধি প্রসারিত একটি জায়গার নাম দিয়েছেন রাশিচক্র বা zodiacal belt যেখানে তারাগুলো সরলরেখা,ত্রিভুজ জাতীয় জ্যামিতিক বিন্যাসে ঘুরতে থাকে।আশ্চর্যের বিষয় হলো বছরের পর বছর তারাগুলো এখানে অবিকৃতভাবে ঘুরতে থাকে, ঘুরে বেড়ানোর সময় তারাগুলোর মধ্যে দূরত্ব বা জ্যামিতিক বিন্যাসে কোন ধরনের হেরফের বা পরিবর্তন ঘটেনা।

রাশিচক্রের ১২ টি ভাগের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১।Aries(মেষরাশি)
২।Taurus(বৃষরাশি)
৩।Gemini(মিথুনরাশি)
৪।Cancer(কর্কটরাশি)
৫।Leo(সিংহরাশি)
৬।Virgo(কন্যারাশি)
৭।Libira(তুলারাশি)
৮।Scorpius(বৃশ্চিকারাশি)
৯।Sagitarius (ধনুরাশি)
১০।Copricornus(মকররাশি)
১১।Aquarius(কুম্ভরাশি)
১২।Pisces(মীনারাশি)

রাশিচক্র সম্পর্কে পবিত্র আল কুরআনের সূরা হিজরের ১৬ নং আয়াতে উল্লেখ রয়েছে-

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِى السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّزَيَّنّٰهَا لِلنّٰظِرِيْنَ ۙ

আমি আকাশে গ্রহ - নক্ষত্র(রাশিচক্র) সৃষ্টি করিয়াছি এবং উহাকে সুশোভিত করিয়াছি দর্শকদের জন্য;

পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষায় চমৎকার ব্যবস্থাপনা:পানিচক্র (Water Cycle)

পানির অপর নাম জীবন।পানি ছাড়া জীবজগত কল্পনাও করা যায় না।পরম করুণাময় মহান আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে এই অশেষ নেয়ামত দান করেছেন।পানির ভারসাম্য রক্ষিত না হলে জীবজগতসহ পুরো ধরণীর অস্তিত্ব সংকটে পরিণত হবে।এই ভারসাম্য রক্ষার চমৎকার একটি সিস্টেম হলো water cycle বা পানিচক্র।

প্রথমেই জেনে নেওয়া যাক পানিচক্র বলতে কি বোঝায়-এটি হলো সেই চক্রাকার সিস্টেম যেখানে প্রাকৃতিকভাবেই পানি ক্রমাগত রূপান্তরের মধ্যদিয়ে সঞ্চারণশীল থাকে।এই সাইকেলকে (Hydrological cycle)হাইড্রোলজিক্যাল চক্র ও বলা হয়।

এবার আমাদেরকে জানতে হবে পানিচক্র কিভাবে সম্পন্ন হয়।মূলত পানিচক্র তিনটি ধাপে সংঘটিত হয়।যথা:

১।বাষ্পীভবন
২।ঘনীভবন
৩।অধঃক্ষেপন

প্রথম ধাপ:

পানিচক্রের প্রাথমিক ধাপে পানি বিভিন্ন উৎস যেমন পুকুর,নদী-নালা,সমুদ্র ইত্যাদি থেকে সূর্যের তাপে গরম হয়ে জলীয় বাষ্পে পরিণত হয়।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ **الرَّجْعِ**ۙ

শপথ আসমানের, যাহা ধারণ করে বৃষ্টি,
(সুরা তারিক, আয়াত : ১১)

এই আয়াতে **'রাজআ'** শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, ফিরে আসা।এই শব্দ নিয়ে তাফসিরবিদদের একটি ব্যাখ্যা হলো, এখানে 'রাজআ' শব্দটির অর্থ হবে প্রত্যাবর্তনকারী। বৃষ্টিকে প্রত্যাবর্তনকারী বলার একটি কারণ এটাও হতে পারে যে সাগর থেকে পানি বাষ্পের আকারে উঠে যায়। আবার এই বাষ্পই পানির আকারে পৃথিবীতে বর্ষিত হয়। (ফাতহুল কাদির)।

দ্বিতীয় ধাপ:

এই ধাপে পানি জলীয় বাষ্পে পরিণত হওয়ার পর তা বায়ুমন্ডলের উপরের দিকে উঠে যায়, এরপর ঠান্ডা হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পানিকনার রূপ ধারণ করে।এই পানিকনাই মেঘের সৃষ্টি করে যখন কনাগুলো বিভিন্ন গ্যাস আর ধুলাবালির সংমিশ্রণে আসে।এই প্রক্রিয়াকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় ঘনীভবন।

মেঘ যখন অনেক ভারী হয়ে যায় তখন মেঘে মেঘে ঘর্ষণের ফলে বজ্রপাতের সৃষ্টি হয়।এই মেঘের পানিকনাগুলো একত্রিত হয়ে বড় আকার ধারণ করে আসমান থেকে বৃষ্টিরূপে জমিনে ঝরে পড়ে।কত চমৎকার রবের তৈরি ব্যবস্থাপনা!

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে,

وَهُوَ الَّذِیْ یُرْسِلُ الرِّیٰحَ بُشْرًۢا بَیْنَ یَدَیْ رَحْمَتِهٖ ؕ حَتّٰۤی اِذَاۤ اَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنٰهُ لِبَلَدٍ مَّیِّتٍ فَاَنْزَلْنَا بِهِ الْمَآءَ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ؕ كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰی لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

তিনিই স্বীয় অনুগ্রহের প্রাক্কালে বায়ুকে সুসংবাদবাহীরূপে প্রেরণ করেন। যখন উহা ঘন মেঘ বহন করে তখন আমি উহা নির্জীব ভূখণ্ডের দিকে চালনা করি, পরে উহা হইতে বৃষ্টি বর্ষণ করি; তৎপর উহার দ্বারা সর্বপ্রকার ফল উৎপাদন করি। এইভাবে আমি মৃতকে জীবিত করি যাহাতে তোমরা শিক্ষা লাভ কর।

(সূরা আরাফ,আয়াত:৫৭)

তৃতীয় ধাপ:

এই ধাপে পানিকনাগুলো অনেক বেশি ঠান্ডা হয়ে যায় ফলে তা বরফে পরিণত হয় এবং শিলাবৃষ্টি রূপে জমিনে পতিত হয়।মেঘ থেকে পুনরায় এভাবে বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি বিভিন্নভাবে পানি পৃথিবীতে ফিরে আসে।এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় অধ:ক্ষেপণ।মাটিতে পানিকনাগুলো পতিত হয়ে চুইয়ে চুইয়ে মাটির গভীরে যেখানে পানি থাকে সেখানে

জমা হয় এবং এক উৎস থেকে আরেক উৎসে চক্রাকারে ঘুরতে থাকে।এভাবেই মহান রবের পরিকল্পনা অনুযায়ী পানিচক্রের সিস্টেমটি সম্পন্ন হয় এবং পৃথিবীতে পানির ভারসাম্য বজায় রেখে জীবজগতসহ পুরো পৃথিবীর সজীবতা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পানিচক্রের এই তৃতীয় ধাপের ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে-

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكَهٗ يَنَابِيْعَ فِى الْاَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهٗ حُطَامًا ۗ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ۝

তুমি কি দেখ না, আল্লাহ্ আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন, অতঃপর উহা ভূমিতে নির্ঝররূপে প্রবাহিত করেন এবং তদ্দ্বারা বিবিধ বর্ণের ফসল উৎপন্ন করেন, অতঃপর ইহা শুকাইয়া যায় ? ফলে তোমরা ইহা পীতবর্ণ দেখিতে পাও, অবশেষে তিনি উহা খড় - কুটায় পরিণত করেন। ইহাতে অবশ্যই উপদেশ রহিয়াছে বোধশক্তিসম্পন্নদের জন্য।"(সূরা যুমার,আয়াত:২১)

এই আয়াত থেকে বোঝা যায় কিভাবে আকাশ থেকে বৃষ্টিরূপে পানি বর্ষণ হয়,ভূগর্ভে তা শোষিত হয়ে ঝরণার আকারে নির্গত হয় অতঃপর তা দ্বারা বিভিন্ন ফসল উৎপন্ন হয়।

পরিমিত বৃষ্টিপাত

প্রতিটি বিষয়েই কিছু সীমারেখা থাকে এর বাইরে চলে গেলে তা ক্ষতিকর হয়ে পড়ে।ঠিক তেমনিভাবে পৃথিবীতে পানিরও পরিমিত (measure amount)পরিমাণ রয়েছে। এই পরিমিত আবর্তনের উপর সমস্ত জীবের জীবনধারণ নির্ভর করে।পৃথিবীতে পরিমিত পানি মহান রবের এক বিস্ময়কর নিদর্শন। এ সম্পর্কে পবিত্র আল কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

وَالَّذِىْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءًۢ بِقَدَرٍ ۚ فَاَنْشَرْنَا بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا ۚ كَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ

“ এবং যিনি আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন পরিমিতভাবে। অতঃপর আমি তদ্দ্বারা সঞ্জীবিত করি নির্জীব জনপদকে। এইভাবেই তোমাদেরকে বাহির করা হইবে।”

(সূরা যুখরুফ,আয়াত:১১)

এখানে আল-কুরআন ‘পরিমিত’ (Measure Amount) বারিপাত সম্পর্কে যে তথ্য আমাদের দেয়, তা আজ অনেক পর্যবেক্ষণ এবং গণনার ফলে নির্ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে।

গবেষণায় দেখা গেছে যে, প্রতি সেকেন্ডে আনুমাণিক ১৬ মিলিয়ন টন পানি বাষ্পাকারে ভূপৃষ্ঠ থেকে উপরে উঠে যায়। এই হিসাব অনুসারে প্রতি বছর ৫১৩ ট্রিলিয়ন টন পানি বাষ্পাকারে ভূপৃষ্ঠ থেকে উপরে উঠে। শুধু তাই নয় আরও দেখা গেছে যে, ঠিক এই একই পরিমাণ পানি বৃষ্টির আকারে পুনরায় পৃথিবীপৃষ্ঠে ফেরত আসে প্রতি বছর।এই পরিমিত বৃষ্টিপাত প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।কিয়ামত পর্যন্ত সিজদায় পড়ে থাকলেও মহান রবের দেওয়া এই নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা কখনোই সম্ভব হবে না।

আকাশ কি সত্যিই নীল!

ভূপৃষ্ঠ থেকে উপরের দিকে তাকালেই চোখে পড়ে দিগন্ত বিস্তৃত নীল আকাশ। নীল আকাশ দেখে মন প্রাণ ভরে উঠে। কিন্তু সত্যিই কি আকাশের রঙ নীল?

আকাশ নিয়ে বিভিন্ন ধারণা প্রচলিত রয়েছে।এর মধ্যে গ্রামে প্রচলিত একটি কল্পকথা এরূপ: আকাশ জমাটবাধা ছাদের মতো।এর মধ্যে চাঁদ,সূর্য সবই গেঁথে আছে।একের পর এক এভাবে করে সাত আসমান তৈরি হয়েছে।কিন্তু এই প্রচলিত ধারণাটি নিছকই কল্পকাহিনী।আকাশ জমাটবাধা কিছু নয় বরং আসমান জমীন মহান রবের হুকুমে এভাবে স্থির হয়ে আছে।

আকাশ মানে হলো space বা শূন্য। আকাশের প্রকৃত রঙ নীল নয়।সূর্যের সাতটি রং রয়েছে।এর মধ্যে একটি হলো অতিনীল (indigo)।বায়ুমন্ডলে অবস্থিত বিভিন্ন গ্যাস ও জলীয় কণা এই অতিনীল রশ্মি শোষণ করে নীল বর্ণ ধারণ করে।এজন্য আকাশকে নীল চাঁদোয়ার মতো দেখায়।

الَّذِىْ جَعَلَ لَـكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّـكُمْ ۚ فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْـتُمْ تَعْلَمُوْنَ

“যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বিছানা ও আকাশকে ছাদ (নীল চাঁদোয়া) করিয়াছেন এবং আকাশ হইতে পানি বর্ষণ করিয়া তদ্দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন। সুতরাং তোমরা জানিয়া - শুনিয়া কাহাকেও আল্লাহ্‌র সমকক্ষ দাঁড় করাইও না।

(সূরা বাক্বারাহ,: আয়াত : ২২)

সৃষ্টির শুরুতে আকাশের প্রকৃত অবস্থা কেমন ছিল এ সম্পর্কেও মহান রব আমাদেরকে জানাচ্ছেন-

ثُمَّ اسْتَوٰٓى اِلَى السَّمَآءِ وَهِىَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا ۗ قَالَتَآ اَتَيْنَا طَآئِعِيْنَ

"অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন যাহা ছিল ধূম্রপুঞ্জবিশেষ। অনন্তর তিনি উহাকে ও পৃথিবীকে বলিলেন, 'তোমরা উভয়ে আস ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়।' উহারা বলিল, 'আমরা আসিলাম অনুগত হইয়া।'
(সূরা হামীম ;আয়াত১১)।

পর্বত পেরেকসদৃশ

ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্তর রয়েছে এর মধ্যে সবচেয়ে উপরের স্তর যেখানে আমরা বসবাস করি এর নাম হলো Lithosphere ।ভূতওত্ত্বিদদের মতে,পৃথিবীর ব্যাসার্ধ প্রায় ৩৭৫০ মাইল।আমরা ভূপৃষ্ঠের যে স্তরে বসবাস করি এই কঠিন আবরণটি অনেক পাতলা।এর পুরুত্ব প্রায় ১ থেকে ৩০ মাইল।ফলে কম্পনের সম্ভাবনা অনেক বেশি।এক্ষেত্রে পর্বত সমূহ পৃথিবীর পেরেক হিসেবে ভূমিকা পালন করে এবং ওই কঠিন পাতলা আবরণটিকে ধরে রাখে।

পবিত্র আল কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا ۙ
وَّالْجِبَالَ **اَوْتَادًا** ۙ

"আমি কি করি নাই ভূমিকে শয্যা
ও পর্বতসমূহকে কীলক?"

আয়াতে ''আওতাদ'' শব্দের অর্থ হলো খুঁটি বা কীলক (সেগুলোর মতো যা তাবু খাটাতে ব্যবহার করা হয়)।এগুলো ভূতাত্ত্বিক ভাঁজসমূহের(Geological Folds) গভীর ভিত্তি।পর্বত জমিনকে ভূকম্পন থেকে সুরক্ষিত রাখে।

মানবজীবনের ক্রমবিকাশ:মানবভ্রূণ

মানবজীবনের রহস্যময় একটি স্তর হলো ভ্রূণপর্যায়। বৃটিশ ভ্রূণতত্ত্ববিদ ভন বেয়ার ১৮২৭ সালে ভ্রূণ বিকাশের স্তরসমূহ আবিষ্কার করেন।মাতৃগর্ভে ভ্রূণ বিকাশের জন্য কেবল একটিমাত্র শুক্রাণু ও একটিমাত্র ডিম্বাণু প্রয়োজন।মহান রবের হুকুমে এভাবেই লক্ষ লক্ষ শুক্রাণু ও ডিম্বাণু থেকে মাত্র একটি ডিম্বাণু ও শুক্রাণু মিলিত হয়ে নিষেক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে। এই অবস্থায় যে কোষটি তৈরি হয় বিজ্ঞানের ভাষায় একে বলা হয় জাইগোট। পরবর্তীতে এই জাইগোট জরায়ূতে (uterus) প্রতিস্থাপিত হয়।এরপর ক্লিভেজ প্রক্রিয়ায় জাইগোট বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন স্তরের সূচনা করে।বিজ্ঞান যেখানে সম্প্রতি ভ্রূণ বিকাশের স্তর আবিষ্কার করেছে সেখানে মহান রব তার গ্রন্থ পবিত্র আল কুরআনে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বেই এই স্তরসমূহের কথা বিভিন্ন সূরায় উল্লেখ করেছেন।

পবিত্র আল কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

"তিনি আল্লাহ, যিনি তোমাদেরকে বিভিন্ন স্তর থেকে সৃষ্টি করেছেন"(সূরা নূহ;১৪)।

ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِىْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ **سُلٰلَةٍ** مِّنْ طِيْنٍ

ثُمَّ خَلَقْنَا **النُّطْفَةَ** عَلَقَةً فَخَلَقْنَا **الْعَلَقَةَ** مُضْغَةً فَخَلَقْنَا **الْمُضْغَةَ** عِظٰمًا فَكَسَوْنَا **الْعِظٰمَ لَحْمًا**
ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ ؕ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ **الْخٰلِقِيْنَ**

আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছি মৃত্তিকার উপাদান হইতে,
অতঃপর আমি উহাকে শুক্রবিন্দুরূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে;পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি আলাক - এ, অতঃপর আলাক্‌কে পরিণত করি পিণ্ডে এবং পিণ্ডকে পরিণত করি অস্থি - পঞ্জরে ; অতঃপর অস্থি - পঞ্জরকে ঢাকিয়া দেই গোশ্‌ত দ্বারা; অবশেষে উহাকে গড়িয়া তুলি অন্য এক সৃষ্টিরূপে। অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ্‌ কত মহান!
(সূরা মুমিনূন, আয়াত:১২-১৪)

নিম্নে কুরআন ও বিজ্ঞান থেকে স্তরসমূহ পর্যায়ক্রমে তুলে ধরা হলো:

১।সুলালাহ (সারনির্যাস):সুলালাহ হলো মানুষ তৈরির মূল উপাদান যা থেকে মানুষ তৈরির মলিকিউল আহরিত হয়।পিতামাতার পুষ্টির প্রয়োজনে মাটির সার নির্যাস থেকে যেসব উপাদান আহরিত হয় এ থেকে নুৎফা তৈরি হয়।

২।নুৎফা-জাইগোট:

এর আভিধানিক অর্থ হলো অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দৃষ্ট অতি সূক্ষ্ম জনন কোষ।জাইগোটকেও কুরআনে নুৎফা বলা হয়েছে এবং এক্ষেত্রে এরপর 'আমসাজ' শব্দটি এসেছে।জাইগোট তৈরির ২৪ ঘন্টা পর তা বাচ্চাথলির দেয়ালে ঘেরা প্রকোষ্ঠে স্থান লাভ করে এবং ২টি,৪টি,৮টি এভাবে করে কোষ বিভাজন হতে থাকে একে বলা হয় মরুলা(Morula)।

৩।আলাক-ব্লাস্টোসিস্ট

এই আলাক শব্দের অর্থ হলো জমাটবদ্ধ রক্তপিন্ড যেটাকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় Blastocyst(ব্লাস্টোসিস্ট)।জোঁক রক্ত চুষে নেওয়ার পর যেরূপ আকার ধারণ করে এটি দেখতে অনেকটা সেরকম হয়।৩ থেকে ৪ সপ্তাহের মধ্যে আলাক বা জোঁক সদৃশ রূপ ধারণ করে।

৪।মুদগাহ-সুমিটেস

মুদগাহ মানে হলো মাংসপিন্ড।অর্থাৎ ভ্রূণ রক্তপিণ্ড থেকে ধীরে ধীরে মাংসপিন্ডে পরিণত হয়।এ প্রক্রিয়া অন্তত ২৩-৪২ দিন অবধি চলতে থাকে।এ সময় মাংসপিন্ডকে চর্বণ করা বস্তুর মতো দেখা যায়(chewed like substance)। এ সময় ১৩ টি খাঁজকাটা মাংসপিন্ডের ব্লক ভ্রূণের শিরদাড়ায় সজ্জিত থাকে।যেগুলোকে বলা হয় mesodermal segments ।

৫।ইযাম-স্কেলিটন

ইযামকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় স্কেলিটন বা অস্থি।এ পর্যায়ে ধীরে ধীরে অস্থি তথা কঙ্কাল গঠিত হওয়া আরম্ভ করে।প্রথম ৬ সপ্তাহে কচি অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলোর টিস্যু কোমল অস্থিতে রূপান্তরিত হতে থাকে।১২ সপ্তাহের মধ্যে ক্ষুদ্র পূর্ণাঙ্গ কঙ্কাল গঠিত হয়।অর্থাৎ ৩৬০ টি অস্থিসহ কঙ্কাল গঠিত হয় ১২ সপ্তাহের ভেতরে।

৬।লাহম-মাসলস

৭ম সপ্তাহ থেকে কঙ্কালতন্ত্র বিস্তার লাভ করে। এ সময়ে অস্থিগুলোও যথাযথ আকার ধারণ করে।৮ম সপ্তাহ থেকে মাংসপেশী দ্বারা অস্থি আবৃত হতে থাকে।৮ম সপ্তাহ সম্পন্ন হলে পেশীতন্ত্র,অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, মাথা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠে।এই পর্যায়ে ভ্রূণটি নড়াচড়া করতে সক্ষম হয়।

৭।রূহ-ফিটাস

রূহ বা ফিটাসই ভ্রূণবিকাশের চূড়ান্ত ধাপ।এই ধাপেই মানবশিশু পরিপূর্ণ রূপ লাভ করে।বিজ্ঞানের ভাষায় ফিটাস মানে হলো Miniature human body.

অন্ধকার তিনটি পর্দা

মহান রব ভ্রূণকে মায়ের গর্ভে অত্যন্ত সুরক্ষিত অবস্থায় পর্দা বা আবরণী দ্বারা আবৃত করে রাখেন।এটি মানবজাতির প্রতি রবের বিশেষ রহমত। তিনি দয়া করেছেন বলেই মাতৃগর্ভে ধীরে ধীরে ভ্রূণ বেড়ে উঠে পূর্ণাঙ্গ মানবাকৃতি ধারণ করে।এ প্রসঙ্গে পবিত্র আল কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ الْاَنْعَامِ ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ ؕ يَخْلُقُكُمْ فِيْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ خَلْقًا مِّنْۢ بَعْدِ خَلْقٍ فِيْ ظُلُمٰتٍ ثَلٰثٍ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ؕ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ

“তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করিয়াছেন একই ব্যক্তি হইতে। অতঃপর তিনি তাহা হইতে তাহার স্ত্রী সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি তোমাদেরকে দিয়াছেন আট প্রকার আন‘আম তথা চতুষ্পদ জন্তু। তিনি তোমাদেরকে তোমাদের মাতৃগর্ভের ত্রিবিধ অন্ধকারে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনিই আল্লাহ্; তোমাদের প্রতিপালক; সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁহারই; তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই। তবে তোমরা মুখ ফিরাইয়া কোথায় চলিয়াছ ?”

(সূরা আল যুমার, আয়াত : ৬)

কত স্পষ্ট করেই না রব আমাদেরকে এই সূক্ষ্ম সুন্দর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জানিয়েছেন। তবুও আমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে কার্পণ্য করি।কুরআনে বলা এ বিষয়টি এখন বিজ্ঞান দ্বারাও প্রমাণিত। অধ্যাপক কেইথ মূর এর মতানুযায়ী, কুরআনে উল্লেখিত অন্ধকার তিনটি পর্দা হল যথাক্রমে :

১।মায়ের সম্মুখবর্তী উদর প্রাচীর
২।জরায়ুর দেয়াল এবং
৩।শিশুকে ঢেকে রাখা ঝিল্লি (the amino chorionic membrane)

যাওজাইনিজ জাকারা ওয়াল উনছা

জীবজগতে বহুল আলোচিত একটি বিষয় হলো ক্রোমোজম। ক্রোমোজোম ২ ধরনের নিউক্লিক এসিড যেমন :ক।DNA খ।RNA এবং ২ ধরনের প্রোটিন যেমন:হিস্টোন ও ক্রোমোজোমিন নিয়ে গঠিত।ক্রোমোজোম জিন বহন করে এজন্য এটি বংশগতির ধারক বাহক হিসেবে পরিচিত।

পৃথিবীতে অসংখ্য প্রাণী বসবাস করে।প্রজাতি ভেদে এদের ক্রোমোজোম সংখ্যাও ভিন্ন ভিন্ন ও নির্দিষ্ট হয়ে থাকে।মানুষের দেহকোষে মোট ৪৬ টি অর্থাৎ ২৩ জোড়া ক্রোমোজোম রয়েছে।২২ জোড়া ক্রোমোজোম নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই সমানভাবে কাজ করে।বাকি ১ জোড়া ক্রোমোজোম লিঙ্গ নির্ধারণে কাজ করে।এজন্য এদেরকে বলা হয় যৌন ক্রোমোজোম।এগুলো আবার ২ ধরনের :

১.male chromosome (Y)
2.female chromosome (X)

ছেলেদের যৌন ক্রোমোজমের সাংকেতিক চিহ্ন XY, মেয়েদের ক্ষেত্রে XX.এই যৌন ক্রোমোজমের ফলেই শিশুদের লিঙ্গ আলাদা হয় ফলে আকার আকৃতি ও ভিন্ন হয়।এই জোড়া ক্রোমোজোম প্রসঙ্গে পবিত্র আল কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে----

وَاَنَّهٗ خَلَقَ **الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰىۙ**

مِنْ نُّطْفَةٍ اِذَا تُمْنٰى

আর এই যে, তিনিই সৃষ্টি করেন যুগল - পুরুষ ও নারী
শুক্রবিন্দু হইতে, যখন উহা স্খলিত হয়,
(সূরা নাজম, আয়াত:৪৫-৪৬)

উল্লিখিত আয়াতে "যাওজাইনিজ জাকারা ওয়াল উনছা" দ্বারা জোড়া ক্রোমোজোম X,Y কে স্পষ্টভাবেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।সুবহানাল্লাহ!

আধুনিক প্রযুক্তি :ফিঙ্গারপ্রিন্ট

বর্তমানে ব্যক্তি সনাক্তকরণে অন্যতম জনপ্রিয় প্রযুক্তি হলো ফ্রিঙ্গারপ্রিন্ট প্রযুক্তি যার কথা মানুষ পূর্বে কখনো কল্পনাও করতে পারেনি।১৮৮০ সনে বিজ্ঞানী স্যার ফ্লান্সিস গোল্ট গবেষণালব্ধ পরীক্ষা চালান।এরপর থেকে ফ্রিঙ্গারপ্রিন্টকে ব্যক্তি সনাক্তকরণে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসেবে গণ্য করা হয়।কারণ পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের এমনকি যমজ মানুষদের ক্ষেত্রে ও আঙ্গলের ছাপ ভিন্ন।

নাস্তিকরা বিভিন্ন সময়ে মানুষের মৃত্যুর পর পুনরুত্থান নিয়ে প্রশ্ন করে বিতর্ক করে। পবিত্র আল কুরআনে স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা এর জবাব দিয়েছেন।পবিত্র আল কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَّنْ نَّجْمَعَ عِظَامَهٗ
بَلٰى قٰدِرِيْنَ عَلٰى اَنْ نُّسَوِّىَ بَنَانَهٗ

“মানুষ কি মনে করে যে, আমি তাহার অস্থিসমূহ একত্র করিতে পারিব না?বস্তুত আমি উহার অঙ্গুলীর অগ্রভাগ পর্যন্ত পুনবিন্যস্ত করিতে সক্ষম।”

(সূরা ক্বিয়ামাহ’, আয়াত: ৪)

এখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা মৃত্যুর পর পুনরুত্থান এর দিবসে ব্যক্তি সনাক্তকরণে আঙ্গুলের ছাপের কথা ইঙ্গিত করেছেন যা থেকে বর্তমানে বিজ্ঞানীরা ফ্রিঙ্গারপ্রিন্ট এর মতো আধুনিক প্রযুক্তির ধারণা পান যা সত্যিই বিস্ময়কর।

পেইন রিসেপ্টর (Pain Receptor)

আমরা শরীরে যে ব্যথা অনুভব করি এই অনুভূতি যে প্রক্রিয়ায় আমরা টের পাই এর কেন্দ্রবিন্দুতে স্নায়ুতন্ত্র কাজ করে বলে বিজ্ঞান মহলে বিশ্বাস করা হতো।কিন্তু এই ধারণাটি সঠিক নয়।বরং আমাদের চামড়াতে কিছু গ্রন্থি বা গ্ল্যান্ড রয়েছে যা এই অনুভূতি তৈরি করে। এই গ্রন্থিকে বলা হয় pain receptor.

পবিত্র আল কুরআন প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে–

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا ؕ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا

“যাহারা আমার আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে তাহাদেরকে অগ্নিতে দগ্ধ করিবই; যখনই তাহাদের চর্ম দগ্ধ হইবে তখনই উহার স্থলে নূতন চর্ম সৃষ্টি করিব, যাহাতে তাহারা শাস্তি ভোগ করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।”
(সূরা আন নিসা,আয়াত: ৫৬)

এখানে চামড়ায় ব্যথা অনুভবের বিষয়টি স্পষ্ট। থাইল্যান্ডের ‘চিয়াং মাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘anatomy বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক তাগাতাত তেজাসেন এই আয়াতটি নিয়ে গবেষণা চালান।তিনি অনেক বেশি বিস্মিত হন কিভাবে এত বছর পূর্বে নিরেট এই সত্যটি পবিত্র আল কুরআনে উল্লেখ থাকতে পারে!

পরবর্তীতে সৌদির রিয়াদে ৮ম বারের মতো “কুরআন ও সুন্নাহর বৈজ্ঞানিক নিদর্শনাবলী” বিষয়ের উপর যখন মেডিকেল কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় সেখানে সবার উপস্থিতিতে তিনি ঘোষণা করেন-

“লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ”।

প্রতিটি জীব পানি হতে সৃষ্ট

পৃথিবীতে প্রাণ তথা জীবনের প্রাচীনতম নিদর্শনের প্রথম হচ্ছে উদ্ভিদজগৎ। এই প্রাচিনতম যুগকে বলা হয় ক্যামব্রিয়ান।এই সময়েরব আগে এক ধরনের শেওলার অস্তিত্ব ছিল এর নাম 'অ্যালজে'।প্রাণীজীবনের আবির্ভাব ঘটেছিল এর কিছু পরে আর এর উৎপত্তিও ঘটেছিল সমুদ্র থেকেই তথা পানি থেকে।

মানবদেহে সবচেয়ে বেশি যে উপাদান থাকে তা হলো পানি।আধুনিক সময়ে এসে বিজ্ঞানের সুবাদে আমরা জীবজগত ও প্রাণীজগত সম্পর্কে অনেক কিছুই জানতে পেরেছি।এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি তথ্য হলো সাইটোপ্লাজম। সাইটোপ্লাজমের প্রায় ৮০ ভাগ পানি ।এই সাইটোপ্লাজমই জীবকোষের মৌলিক উপাদান। এছাড়াও অধিকাংশ জীবেই ৫০ থেকে ৯০ ভাগ পানি।জীবনধারণের জন্য পানি অপরিহার্য এক উপাদান।প্রতিটি জীব যে পানি থেকে সৃষ্ট এ প্রসঙ্গে পবিত্র আল কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّنْ مَّآءٍ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِىْ عَلٰى بَطْنِهٖ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِىْ عَلٰى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِىْ عَلٰٓى اَرْبَعٍ ۗ يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۚ

"আল্লাহ্ সমস্ত জীব সৃষ্টি করিয়াছেন পানি হইতে, উহাদের কতক পেটে ভর দিয়া চলে, কতক দুই পায়ে চলে এবং কতক চলে চার পায়ে, আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।"
(সূরা নূর,আয়াত: ৪৫)

আমরা যদি ধূ-ধূ মরুভূমির কথা চিন্তা করি তাহলে প্রথমেই যে জিনিসটা মাথায় আসে তা হলো পানির সংকট।এই পানির সংকটপূর্ণ অবস্থায় বসবাসরত মানুষ কি কখনো কল্পনাও করতে পারে এই পানি থেকেই মানুষের সৃষ্টি হয়েছে? তাহলে কিভাবে আল্লাহর নবি মুহাম্মদ ছল্লাল্লাহু ''আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে মরুর বুকে মনগড়া এই অনুমানটি করতে পারে? প্রকৃতপক্ষে পবিত্র আল কুরআনই সত্য গ্রন্থ এবং মুহাম্মদ ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মহান রবই ওহির মাধ্যমে এই নিরেট বৈজ্ঞানিক তথ্য সম্পর্কে অবগত করেছেন।

সবকিছুই জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করা হয়েছে

পৃথিবীতে যা কিছুই রয়েছে যেমন মানুষ, প্রাণী,বস্তু এমনকি যা কিছু আমাদের জানার বাইরে রয়েছে সেগুলোও জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করা হয়েছে।বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় এ সম্পর্কে আমরা সম্প্রতি অবগত হলেও মহান রব তার পবিত্র আল কুরআনের ঐশীবাণীতে আমাদেরকে অনেক আগেই তা জানিয়ে দিয়েছেন।

পবিত্র আল কুরআনে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি প্রসঙ্গে উল্লেখ রয়েছে -
سُبْحٰنَ الَّذِیْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا یَعْلَمُوْنَ

“পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি উদ্ভিদ, মানুষ এবং উহারা যাহাদেরকে জানে না তাহাদের প্রত্যেককে সৃষ্টি করিয়াছেন জোড়া জোড়া করিয়া।
(সূরা ইয়াসিন,আয়াত: ৩৬)

আশ্চর্যের বিষয় হলো জোড়ায় জোড়ায় বলতে প্রতিটি জিনিসের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।যেমন: বিদ্যুৎ। এর যেমন ধনাত্মক(positive)চার্জ রয়েছে তেমনি রয়েছে এর বিপরীত ঋণাত্নক(n) চার্জ।এছাড়াও পরমাণুতে যেমন ধনাত্মক চার্জবাহী প্রোটন রয়েছে তেমনি এর রয়েছে ঋণাত্নক চার্জবাহী ইলেকট্রন।এভাবেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা সূক্ষ্ম ব্যবস্থাপনার মধ্যদিয়ে পৃথিবীকে করে তুলেছে বসবাসযোগ্য। সুবহানাল্লাহ! তবুও কি করে আমরা মহান রবের দেওয়া এত নেয়ামতের শুকরিয়া আদায়ে কার্পণ্য করি?

মৌমাছির কর্মবন্টন ও সরলপথ

আল্লাহর দেওয়া নিদর্শনের অন্যতম একটি নিদর্শন হল মৌমাছি। মৌমাছি নিয়ে পবিত্র আল 6 সম্পূর্ণ একটি সূরা নাযিল হয়েছে-সূরা নাহল।যেখানে মৌমাছির চলাচল,বাসা বানানো, মৌমাছির প্রকারভেদ অনুযায়ী এর কাজ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

পবিত্র আল কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِيْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَّمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ ثُمَّ كُلِيْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ **فَاسْلُكِى** سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۚ يَخْرُجُ مِنْۢ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

তোমার প্রতিপালক মৌমাছিকে উহার অন্তরে ইঙ্গিত দ্বারা নির্দেশ দিয়াছেন, ‘গৃহ নির্মাণ কর পাহাড়ে, বৃক্ষে ও মানুষ যে গৃহ নির্মাণ করে তাহাতে;‘ইহার পর প্রত্যেক ফল হইতে কিছু কিছু আহার কর, অতঃপর তোমার প্রতিপালকের সহজ পথ অনুসরণ কর।’ উহার উদর হইতে নির্গত হয় বিবিধ বর্ণের পানীয়; যাহাতে মানুষের জন্য রহিয়াছে আরোগ্য। অবশ্যই ইহাতে রহিয়াছে নিদর্শন চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।

(সূরা নাহল,আয়াত:৬৮- ৬৯)

আয়াতদ্বয়ে মৌমাছির সহজ সরলপথে চলাচলের দিক স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে।বিজ্ঞানের বদৌলতে আমরা এই ধরনের চলাচল সম্পর্কে জানতে পারি।মৌমাছি কোন নতুন বাগান বা ফুলের সন্ধান পেলে চাকে ফিরে এসে অন্য সদস্যদেরকে জানান দেয়।হুবহু একই পথ অনুসরণ করে বাকি সদস্যগণও সেই মধু আহরণে চলে যায়।এটাকেই বলা হচ্ছে সহজ সরল পথ যেটাকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হচ্ছে Bee Dance।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ও চমকপ্রদ বিষয় হল আয়াতে গৃহ নির্মাণের কাজের জন্য **‘‘ফাসলুকি’’**শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যা একটি স্ত্রীবাচক শব্দ। কুরআন স্পষ্টভাবে গৃহ

নির্মাণের কাজের ক্ষেত্রে স্ত্রীবাচক শব্দ ব্যবহার করেছে তার মানে এই কাজ স্ত্রী মৌমাছির।

শেক্সপিয়ারের সময়কালেও মনে করা হতো মৌমাছি ২ প্রকার।পুরুষ ও স্ত্রী মৌমাছি।তবে আধুনিকে সময়ে এসে জানা গেছে যে,মৌমাছি আসলে ৩ প্রকার।পুরুষ, স্ত্রী ও কর্মী মৌমাছি।গৃহ নির্মাণের কাজ মূলত কর্মী মৌমাছিই করে থাকে।এগুলোর কাজ রাণী মৌমাছিকে সাহায্য করা, গৃহ নির্মাণ করা তবে এগুলোও এক ধরনের স্ত্রী মৌমাছি তবে সন্তানদানে অক্ষম মানে বন্ধ্যা।আশ্চর্যের বিষয় হলো গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে আয়াতে স্ত্রীবাচক শব্দ দ্বারা এই কর্মী মৌমাছির প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে আর এই সত্যটি জানতে বিজ্ঞানের লেগেছে প্রায় ৩০০ বছর।

পিপীলিকার জীবনপদ্ধতি

পিপীলিকা সম্পর্কে পবিত্র আল কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

حَتّٰٓى اِذَآ اَتَوْا عَلٰى وَادِ النَّمْلِ ۙ قَالَتْ نَمْلَةٌ يّٰٓاَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا مَسٰكِنَكُمْ ۚ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَجُنُوْدُهٗ ۙ وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ

যখন উহারা পিপীলিকা - অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌঁছিল তখন এক পিপীলিকা বলিল, 'হে পিপীলিকা - বাহিনী! তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ কর, যেন সুলায়মান এবং তাহার বাহিনী তাহাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদেরকে পদতলে পিষিয়া না ফেলে।'

(সূরা নামল, আয়াত: ১৮)

পিপীলিকা দলবদ্ধ জীবনযাপন করে এই বিষয়টি উক্ত আয়াত থেকে বোঝা যায়।শুধু তাই নয় আধুনিক সময়ে এসে পিপীলিকা সম্পর্কে বিভিন্ন আশ্চর্যজনক তথ্যও আবিষ্কৃত হয়েছে যা মানুষ কখনো কল্পনাও করতে পারেনি।

গবেষণায় দেখা গেছে পিপীলিকার জীবনধারণ পদ্ধতি মানুষের জীবনযাপনের সাথে অনেকটাই সাদৃশ্যপূর্ণ। গবেষণায় পাওয়া কিছু তথ্য নিচে উপস্থাপন করা হলে:

১।মানুষের মতো পিপীলিকারাও একইভাবে মরদেহ কবরস্থ করে।
২।শ্রম বিজাজনের (division of labour)পদ্ধতি বজায় রেখে চলে অর্থাৎ কে কোন কাজ করবে সেই অনুযায়ী শ্রমিক প্রধান,তত্ত্বাবধায়ক ইত্যাদি পদবি রয়েছে।

৩।নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের উন্নত পদ্ধতি রয়েছে।
৪।মাঝে মাঝে খোশগল্প করার জন্য একত্রিত হয়।
৫। দ্রব্যাদি বিনিময়ের জন্য বাজার বসায়।
৬।শীতকালে দীর্ঘসময়ের জন্য খাদ্যশস্য জমা করে রাখে।
৭।জমাকৃত খাদ্য ভিজে গেলে শুকোনোর জন্য রোদে বের করে আনে আবার শুকিয়ে গেলে ভেতরে রেখে দেয়।

বিষয়টি এমন,তারা হয়তো এটা বুঝে যে ভেজা বা আর্দ্রতা অঙ্গুর গজানোর কারণ আর এমনটি হলে খাদ্য পচে যাবে বা সংরক্ষণ করে রাখা কঠিন হবে এজন্য আগেভাগেই খাদ্য শুকিয়ে নিরাপদে সংরক্ষণ করে।সুবহানাল্লাহ!

চিকিৎসাশাস্ত্রে মধু

প্রাচীনকাল থেকেই মধুর রয়েছে ব্যাপক চাহিদ।ওষুধ বানানো থেকে শুরু করে রূপচর্চা সবক্ষেত্রেই এর ছোঁয়া লেগে রয়েছে।তবে তারা জানত না মধু কিভাবে তৈরি হয়।মাত্র ২ শতাব্দী পূর্বে মানুষ এই সত্যটি জানতে পেরেছে যে,মধু বের হয় মৌমাছির পেট থেকে।অথচ পবিত্র আল কুরআনে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বেই মহান আল্লাহ তা জানিয়ে দিয়েছেন।পবিত্র আল কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

ثُمَّ كُلِىْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ فَاسْلُكِىْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ؕ يَخْرُجُ مِنْۢ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

‘ইহার পর প্রত্যেক ফল হইতে কিছু কিছু আহার কর, অতঃপর তোমার প্রতিপালকের সহজ পথ অনুসরণ কর।’ উহার উদর হইতে নির্গত হয় বিবিধ বর্ণের পানীয়; যাহাতে মানুষের জন্য রহিয়াছে আরোগ্য। অবশ্যই ইহাতে রহিয়াছে নিদর্শন চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।

(সূরা নামল,আয়াত: ৬৯)

মধু তৈরির পুরো প্রক্রিয়াটি এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।আরও বলা হয়েছে মধুর উপকারিতা সম্পর্কে। মধু হলো আরোগ্যদানকারী উপাদান।মধুর রয়েছে অনেক উপকারিতা সর্দি,কাশিসহ জীবাণুনাশক হিসেবেও রয়েছে এর ব্যবহার।

২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় রাশিয়ানরা ক্ষত ঢাকার জন্য মধু ব্যবহার করত।এর ঘনত্বের কারণে ছত্রাক বা জীবাণু জন্মাতে পারেনা।এছাড়াও এতে রয়েছে ফ্রুকটোজ ফলে খেতে মিষ্ট এবং ভিটামিন k এর একটি ভালো উৎস।

আরেকটি আশ্চর্যজনক বিষয় হলো কোন ব্যক্তি বিশেষ কোন উদ্ভিদের কারণে যদি এলার্জিতে ভোগেন তাহলে ওই উদ্ভিদের মধু পান করালে তার শরীরে ওই এলার্জির প্রতি antibody বা প্রতিরোধক্ষমতা তৈরি হয়।ফলে এলার্জি থেকে নিরাময় লাভ করেন।

Hurt and Pollution

প্রতিমাসে মহিলাদের জরায়ু থেকে বিশেষদিনগুলোতে যে রক্তক্ষরণ হয় একে বলা হয় menstruation বা ঋতুস্রাব। এর মাধ্যমে শরীর থেকে দূষিত রক্ত বের হয়ে যায়।এই প্রসেসকে পবিত্র আল কুরআনে Hurt and pollution বলা হয়েছে, অবশ্য এর পেছনে বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও কারণও রয়েছে।

ডা.ক্যাথেরীন নামক একজন বৃটিশ মহিলা ডাক্তার, তিনি মাসিকের রক্তক্ষরণ নিয়ে গবেষণা চালিয়েছেন।তার গবেষণায় দেখা যায় যে,মাসিক শুরুর ঠিক আগে কিংবা মাসিক চলাকালীন মেয়েদের শরীর তুলনামূলক অন্য সময়ের চেয়ে বেশি দুর্বল থাকে।এছাড়াও কর্মদক্ষতা অনেকখানি কমে যায়।অবসন্নতা, অমনোযোগীতা,দৈনন্দিন কাজের প্রতি অনীহা ২৬%-৩৬% বৃদ্ধি পায়।

চিকিৎসাবিজ্ঞান এ তথ্য প্রমাণ করেছে যে,ঋতুস্রাব চলাকালীন স্বামী স্ত্রীর যৌন সম্পর্ক ও ক্ষতিকর, এমনকি উভয়েরই জীবাণু সংক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে।কারণ এ সময়ে জরায়ুর মুখ খোলা থাকে।জরায়ুর দুই পাশে ফেলোপিয়ান টিউব রয়েছে।এর মাধ্যমে সরাসরি জরায়ু তলপেটের গহব্বরের সাথে সংযুক্ত। এই সংযুক্তির ফলে সহজেই সংক্রমণের ঝুঁকি থাকে।যদি নারীর যৌন নালীতে গনোরিয়া বা সিফিলিসের মতো রোগ থাকে তবে ওই রোগ দ্রুত ভেতরের দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ডা.গ্রাহামের মতে,” *ঋতুকালে স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকার বিষয়টি মনস্তাত্ত্বিক নয় বরং স্বাস্থ্যগত।”*

এই বিষয়ে মহান রব পবিত্র আল কুরআনে মানবজাতির উদ্দেশ্যে সতর্কবানী জানিয়ে বলেছেন-

وَ يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ؕ قُلْ هُوَ اَذًى فَاعْتَزِلُوْا النِّسَآءَ فِى الْمَحِيْضِ ۙ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ ۚ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

“লোকে তোমাকে রজঃস্রাব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। বল, ‘উহা অশুচি।’ সুতরাং তোমরা রজঃস্রাবকালে স্ত্রী - সংগম বর্জন করিবে এবং পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী - সংগম করিবে না। অতঃপর তাহারা যখন উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হইবে তখন তাহাদের নিকট ঠিক সেইভাবে গমন করিবে যেভাবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে আদেশ দিয়াছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তওবাকারীকে ভালবাসেন এবং যাহারা পবিত্র থাকে তাহাদেরকেও ভালবাসেন।”

(সূরা বাক্বারাহ,আয়াত:২২২)

এখানে “আযান” শব্দের একটি অনুবাদ হলো Hurt and Pollution। এর আরও একটি অর্থ হলো impurity বা অপবিত্রতা। এ সময়ে স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থেকে যখন স্ত্রী পবিত্র হয়ে যাবে তখন সহবাসের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যা চিকিৎসা বিজ্ঞানেও বলা হয়।

শূকরের মাংস খাওয়া কেন হারাম?

মহান আল্লাহ আমাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ খাওয়া বৈধ করেছেন এবং শুধু অপবিত্র বস্তুসমূহ হারাম করেছেন।শূকরের মাংস খাওয়াকে কুরআনে নিষেধ করা হয়েছে।এর যথেষ্ট কারণ রয়েছে যা আজ বিজ্ঞান দ্বারাও প্রমাণিত।

পবিত্র আল কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

“আল্লাহ্ তো কেবল মৃত জন্তু, রক্ত, শূকর - মাংস এবং যাহা যবেহকালে আল্লাহ্র পরিবর্তে অন্যের নাম লওয়া হইয়াছে তাহাই তোমাদের জন্য হারাম করিয়াছেন, কিন্তু

কেহ অবাধ্য কিংবা সীমা লঙ্ঘনকারী না হইয়া অনোন্যপায় হইলে আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

(সূরা নাহল,আয়াত:১৫)

বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থ ব্যতীত বিজ্ঞানের মাধ্যমেও আজ প্রমাণিত হয়েছে যে,শূকরের মাংস মানুষের জন্য অনেক ক্ষতিকর। শূকরের মাংস ভক্ষণ করলে কমপক্ষে ৭০টি রোগের উদ্ভব ঘটাতে পারে।এছাড়াও বিভিন্ন কৃমি দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে যেমন বৃত্তাকার কৃমি, ক্ষুদ্র কাঁটাযুক্ত কৃমি এবং বক্র কৃমি।। শূকরের মাংস খাওয়ার সবচেয়ে ক্ষতিকর দিক হলো, শূকররের মাংসে ফিতা কৃমির শুক্রকীট থাকে; এটি টিনিয়া সলিয়াম (Taenia Solium) নামে পরিচিত।একে ফিতা কৃমিও বলা হয় যা পেটের মধ্যে বেড়ে ওঠে এবং অনেক লম্বা হয়। এ কৃমি প্রায় ২-৩ মিটার পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। এর ডিমগুলো মস্তিষ্কে বৃদ্ধি পেলে মানুষ পাগলামি ও হিস্টিরিয়া রোগে আক্রান্ত হতে পারে।আর যদি হার্টে বৃদ্ধি পায় তাহলে মানুষ উচ্চ রক্তচাপ ও হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত হতে পারে।

শূকরের মাংসের মধ্যে ট্রিচিনিয়াসিস কৃমির শুক্রকীট থাকতে পারে যা রান্না করলেও মরে না। মানুষের শরীরে এ কৃমি বাড়ার ফলে প্যারালাইসিস ও চামড়ায় ফুসকুড়িতে আক্রান্ত হতে পারে, হৃদযন্ত্রের মধ্যে ঢুকলে বন্ধ করে দিতে পারে হৃদযন্ত্রক্রিয়া এবং চোখে ঢুকলে অন্ধত্বের কারণ হয়।এর মানে হলো এটা শরীরের যে কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কর্মক্ষমতাকে ধ্বংস করে দিতে পারে। আরেকটি ভয়ংকর কৃমি হলো 'ত্রীচুরা টিচুরাসীস্থ'। এটা নিয়ে আমেরিকার গবেষণায় দেখা গেছে যে,ভালো করে রান্না করার পরও প্রতি ২৪ জনের ২২ জনই এই 'ত্রীচুরাসীস্থ' দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে।

এছাড়াও শূকর অত্যন্ত নির্লজ্জতম প্রাণী। পশুর মধ্যে একমাত্র শূকরই একমাত্র এমন যে, তার স্ত্রী-সঙ্গীর সাথে সঙ্গম করার জন্য অন্যান্য পুরুষ সঙ্গীদের ডেকে আনে।লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে ইউরোপ-আমেরিকার অধিকাংশ মানুষের প্রিয় খাদ্য শূকরের মাংস। বিজ্ঞানের একটি সূত্র হলো খাদ্যাভ্যাস আচরণে প্রকাশ পায়, এ সূত্রের জীবন্ত নমুনা তারাই।তাদের প্রিয়কাজ হলো নেচে-গেয়ে পার্টি জমানো আর উত্তেজনায় উন্মত্ত হয়ে একে অপরের সাথে বউ বদল করা। এমনকি অনেকেই আবার স্ত্রীর সাথে মিলিত হতে বন্ধুবান্ধব ডেকে নেয়। কাজেই এটি প্রমাণ করে যে, শূকরের মাংস মানুষকে নির্লজ্জতার দিকে ধাবিত করে।

সালাতের উপকারিতা:বৈজ্ঞানিক রহস্য

একজন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের দেহে মোট সন্ধি জোড়ার সংখ্যা ৩৬০ টি।এগুলোর নিয়মিত মুভমেন্টের ফলে শরীর ও মন সুস্থ থাকে।এই মুভমেন্টের চমৎকার একটি উদাহরণ হলো সালাত যা ইসলামী শরীয়াতের ২য় গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ।মহান রব মেহেরবানী করে আমাদেরকে এই তাৎপর্যপূর্ণ ও উপকারি ইবাদতটি উপহার দিয়েছেন।এজন্য আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।পবিত্র আল কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ

"তোমরা সালাত কায়েম কর ও যাকাত দাও এবং যাহারা রুকূ' করে তাহাদের সঙ্গে রুকূ' কর।

(সূরা বাক্বারাহ, আয়াত :৪৩)

বিজ্ঞানের দ্বারা প্রমাণিত যে,রক্ত সঞ্চালন স্বচ্ছ এবং স্বাভাবিক রাখার জন্য সালাত আদায়ের পদ্ধতির চেয়ে উত্তম শারিরীক পদ্ধতি আর হতেই পারে না।সালাতের মাধ্যমে দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মুভমেন্ট ঘটে যা শরীরকে সুস্থ রাখার পূর্বশর্ত।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে সালাত কে পর্যবেক্ষণ:

ক।কিয়াম:সুস্থ স্বাভাবিক একজন ব্যক্তিকে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে হয়। এ সময় স্থির হয়ে দাঁড়াতে হয় এবং চোখ নিবদ্ধ থাকে সিজদা দেওয়ার স্থানের দিকে।এ সময় অভিকর্ষ টানের ফলে বেশিরভাগ রক্ত পায়ের দিকে চলে আসে। ফলে রক্ত হার্টে ফিরে যেতে সময় লাগে। যার দরূণ হৃদস্পন্দন বেড়ে যায় এবং শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায়।এই তাপমাত্রা শরীরের বিপাক ক্রিয়ার হারকে বৃদ্ধি করে ও কোষে শক্তি বাড়িয়ে দেয়।

খ।রুকূ:কিয়ামের পরপরও রুকূতে যেতে হয়।এ সময় দুই হাত দুই হাটুসন্ধিতে স্থাপন করতে হয়, হাতের আঙ্গুলগুলো ফাঁকা অবস্থায় থাকে।পিঠ আর মাথা ভূমির সমান্তরালে থাকে।এ অবস্থায় মেরুদন্ডের ৩৩ টি কশেরুকা হাড়ে রক্ত সঞ্চালন ঘটে।নিয়মিত রুকুর

ফলে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক ও গতিশীল থাকে।এমনকি বৃদ্ধাবস্থায় ও দেহের ভারসাম্য ঠিক থাকে।

গ)সেজদা:

সেজদাবনত হয়ে মহান রবের স্মরণে এক অপার্থিব প্রশান্তি রয়েছে যা আর অন্য কোন কিছুতে পাওয়া যায় না।এ সময় দুই হাত,দুই পা,দুই হাটু, কপাল ও নাক মহান রবের সামনে অবনত করতে হয়।এর ফলে প্রায় ২০৬ টি হাড়ে এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম কৌশিক জালিকায় রক্ত প্রভাবিত হয়।এছাড়াও এ সময় মনোযোগ আল্লাহর দিকে থাকে ফলে বাইরের কোন উদ্দিপনা বা stimulus ক্ষতিকর আলোড়ন তৈরি করতে পারেনা

ঘ)শেষ বৈঠক:

একজন সালাত আদায়কারীকে এ সময় ডান পা খাড়া রেখে বাম পা বিছিয়ে দিয়ে এর উপর বসতে হয়।এতক্ষণ কিয়াম,রুকূ,সেজদার ফলে যে শক্তি ব্যয় হয়েছে এ সময়ে সেই শক্তি তৈরি হয়।অক্সিজেনের সাহায্যে গ্লুকোজ দহন করে শক্তি তৈরি হয়।এই বাড়তি অক্সিজেনের হার জোগাড় করতে শ্বাস-প্রশ্বাসের হার বেড়ে যায়।যতক্ষণ অক্সিজেনের সাহায্যে খাদ্য দহন করে শক্তি উৎপাদন হয় একে বলে সবাত শ্বসন(aerobic respiration)। শরীর যখন আর অক্সিজেন নিতে পারে না তখন শুরু হয় অবাত স্বসন (anaerobic respiration)।সবাত শ্বসনের সময় গ্লুকোজ ভেঙে পাইরুভিক এসিড তৈরি হয় এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় গ্লাইকোলাইসিস। অক্সিজেনের সাহায্যে এই পাইরুভিক এসিড আবার বিপাক প্রক্রিয়ায় পানি ও কার্বন-ডাইঅক্সাইড তৈরি করে এবং এর সাথে সাথে উৎপন্ন হয় প্রয়োজনীয় শক্তি।

একজন ব্যক্তি যদি নিয়মিত ৫ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে তারা বিরাট দৈহিক কল্যাণ লাভ করে। কিন্তু এই উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করলে সালাত কবুল হবেনা বরং শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই সালাত আদায় করতে হবে।আমাদের উচিত মহান রবের এই

নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা।পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহ তা'য়ালা গোটা মানবজাতির জন্য এভাবেই প্রতিটি ইবাদতকে কল্যাণময় করে দিয়েছেন সুবহানাল্লাহ।

আল কুরআন তিলাওয়াতের বৈজ্ঞানিক উপকারিতা

বিজ্ঞানের সাথে পবিত্র আল কুরআনের গভীর সম্পর্ক রয়েছে।একজন মুসলিম ব্যক্তি যিনি নিয়মিত তারতিলের সাথে কুরআন তিলাওয়াত করে তার মন থাকে প্রশান্ত।কুরআন তিলাওয়াত করলে ও শুনলে মানসিকভাবে স্বস্তি কাজ করে।ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে এর অনেক ফযিলত রয়েছে।কুরআন তিলাওয়াত করলে ও শুনলে ঈমান বৃদ্ধি পায়, আল্লাহর কথা স্মরণ হয়।শুধু ধর্মীয় দিক নয়,এর বৈজ্ঞানিক উপকারিতাও রয়েছে।

NEWS24 এর ''ইসলাম ও আমরা' অনুষ্ঠানের এক সাক্ষাৎকারে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররম এর সিনিয়র ইমাম শায়খ মুফতি মুহিব্বুল্লাহিল বাকী কুরআন তিলাওয়াতের বৈজ্ঞানিক কিছু উপকারিতা উল্লেখ করেন।যেমন:কুরআন তিলাওয়াতে মানসিক প্রশান্তি পাওয়া যায় যা গানের মধ্যে পাওয়া যায় না।মানুষ গান শুনে মানসিক যন্ত্রণা থেকে বাঁচতে কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্য স্বস্তি দিলেও অপকারই করে থাকে এবং এটি শয়তানের একটি চক্রান্ত।

তিনি সুর নিয়েও কথা বলেন।গানের ক্ষেত্রে দেখা যায়, যদি থেমে যাওয়া হয় তাহলে সুর নষ্ট হয়ে যায়।কিন্তু পবিত্র আল কুরআন এমন একটি কিতাব থেমে থেমে পড়লেও সুর নষ্ট হয় না।আবার যারা বেশি শ্বাস নিয়ে তিলাওয়াত করেন তাদের ক্ষেত্রেও সুর নষ্ট হয় না।এটি পবিত্র আল কুরআনের বিস্ময়কর একটি দিক।সুরের সাথে অন্তরের গভীর সম্পর্ক রয়েছে।অন্তরের তরঙ্গের সাথে সুরের তরঙ্গের মিল রয়েছে।ইসিজি মেশিনে তরঙ্গ যেমন উঠানামা করে তেমনি সুরের তরঙ্গের সাথে অন্তরের তরঙ্গও উঠানামা করে।

ইসলের তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান(রা.)যখন চতুর্দিক থেকে বন্দী অবস্থায় ছিল তখন তিনি নিরবিচ্ছিন্ন হয়ে কুরআন তিলাওয়াত করেছেন।আমাদের ক্ষেত্রে কি এটি

আমরা কল্পনাও করতে পারি!বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দুশ্চিন্তা বা পেরেশানি শারিরীক, মানসিক রোগের এক বড় কারণ আর এই দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিতে পারে কুরআন তিলাওয়াত। তিলাওয়াতের সময় মুখ,চোখ,অন্তর,মেধা সবকিছুর কার্যকলাপ ঘটতে থাকে, নড়াচড়া হতে থাকে যা গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যায়াম। ফলে আখিরাত ছাড়াও জাগতিক সব রোগ ও সমস্যার বড় একটি ট্রীটমেন্ট হলো আল কুরআন।

পবিত্র আল কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ ۙ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ

“হে মানুষ! তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে আসিয়াছে উপদেশ ও তোমাদের অন্তরে যাহা আছে তাহার আরোগ্য এবং মু’মিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত।”
(সূরা ইউনুস, আয়াত ৫৭)

উপসংহার

সৃষ্টিজগতের সমস্ত সৃষ্টিই সূক্ষ্মভাবে পরিচালিত হচ্ছে কেবলমাত্র মহাশক্তিধর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার ক্ষমতাবলে।তার রহমতেই আমরা প্রতিদিন রিযিক পাচ্ছি তবুও আমরা কত নাফরমানি করে যাচ্ছি।আল্লাহ চাইলে আমাদের গুনাহের দরুন আমাদের রিযিক বন্ধ করে দিতে পারতেন কিন্ত তা করেননি।তিনি বড়ই মেহেরবান বড়ই দয়ালু।মহান রব আমাদেরকে অনেক বেশি নেয়ামত দিয়েছেন।তার প্রিয় নবি মুহাম্মদ ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম - এর উপর পবিত্র আল কুরআন অবতীর্ণ করে মানবজাতিকে দেখিয়েছেন হেদায়াতের আলো, মুক্তির পথ।

কুরআনে বিভিন্ন নিদর্শনাবলী রয়েছে,রয়েছে নানান ঘটনাবলী যা উপলব্ধি করলে মহান রবের প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ চলে আসে।তবুও কালক্রমে নাস্তিক মহল আল্লাহকে নিয়ে,নবি করিম ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে, পবিত্র আল কুরআনকে নিয়ে নানান বিতর্কের সূত্রপাত ঘটায়।অথচ তাদের দেওয়া খোড়া যুক্তি কুরআনকে কখনোই ভুল প্রমাণ করতে পারেনি এবং ভবিষ্যতেও পারবেনা।

আধুনিক সময়ে এসে বিভিন্ন বিষয় আবিষ্কৃত হচ্ছে যা প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে মরুর বুকে নাযিল হওয়া পবিত্র আল কুরআনে আগে থেকেই বর্ণিত রয়েছে। পবিত্র আল কুরআন যে মানুষের তৈরি কোন গ্রন্থ নয় বরং একটি ঐশীগ্রন্থ এটিই তার একটি বড় প্রমাণ।

'আধুনিক বিশ্বে কুরআনের বাস্তব নিদর্শন প্রকাশ'' শিরোনামে আলোচ্য বিষয়াবলীতে মূলত এই দিকগুলোই তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।এগুলো ছাড়াও বিজ্ঞানের আরও অসংখ্য থিওরি,আধুনিক জীবনের নানান ধারার আরও অসংখ্য নিদর্শনাবলী ও প্রমাণ পবিত্র আল কুরআনে উল্লিখিত হয়েছে যা আধুনিক সময়ে এসে মানুষজন জানতে পেরেছে।কাজেই আমাদের উচিত পবিত্র আল কুরআনকে নিয়ে আরও গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করা ও মহান রবের সন্তুষ্টি কামনা করা। লিখনীতে কোন ভুল-ত্রুটি হলে তা আমার নফস ও শয়তানের পক্ষ থেকে এবং যা কিছু ভালো তা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার পক্ষ থেকে।
আল্লাহ কবুল করুন। আল্ল হুম্মা আমিন।

রেফারেন্সসমূহ:

১।বিজ্ঞানময় কুরআন -ড.আবু মুহাম্মাদ তালেব

২।কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান সংগতিপূর্ণ নাকি সাংঘর্ষিক? -ড.জাকির নায়েক

৩।বাইবেল,কুরআন ও বিজ্ঞান -ড.মরিস বুকাইলি

৪।কালের কন্ঠ- পত্রিকা

৫।মাসিক আল ইতিছাম

৬।অক্সফোর্ড ডিকশনারি

৭।NEWS24 channel

সমাপ্ত